আলোর কাগজ

তারিখ 24 FEB 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিওভুক্তিতে গলদ বেড়েছে মধ্যম স্তরে

শরীফুল আলম সুমন ▷

'আগে স্কুল-কলেজের বিল্ডিং ছিল কাঁচা আর শিক্ষক ছিল পাকা। আর এখন বিল্ডিং পাকা হচ্ছে, শিক্ষক কাঁচা হচ্ছে।' বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়ই কথাটি বলে থাকেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। গত বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি অধিদপ্তরে গিয়ে তখনকার শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান উপস্থিত কলেজ শিক্ষকদের 'উচ্ছ্বাস' ও 'কৃচ্ছ্রতা' বানান করতে বলেছিলেন। কিন্তু উপস্থিত ৩০ জন শিক্ষকের একজনও বানান দুটি পারেননি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের সর্বশেষ জরিপেও শিক্ষকদের অদক্ষতার চিত্র ফুটে ওঠে। ২০০৮ সাল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষায় চালু হয় সৃজনশীল পদ্ধতি। নতুন পদ্ধতি চালু হওয়ার ছয় বছর পর ২০১৪ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকদের স্ব স্ব বিষয়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করতে বলা হয়। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় বাইরে থেকে প্রশ্নপত্র কিনে বা অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে পরীক্ষা নেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু গত বছর মাউশির জরিপে দেখা যায়, ৪৫ শতাংশ শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারেন না।

একে তো অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া নিষিদ্ধ, আবার নিজেরাও সৃজনশীল পুরোপুরি বোঝেন না, ফলে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে সহায়ক বই বা নোট-গাইডের আশ্রয় নিচ্ছেন শিক্ষকরা। গত বছরের এসএসসি পরীক্ষায়ও নোট-গাইড থেকে হুবহু প্রশ্ন তুলে দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতেই বোঝা যায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের মান কোন পর্যায়ে।

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

এমপিওভুক্তিতে গলদ বেড়েছে মধ্যম স্তরে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

এমনিতেই নানা কারণে দেশে মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকর্ষণ কম। যাঁরা শিক্ষক হতে চান তাঁদেরও প্রথম পছন্দ থাকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে সুযোগ না পেলে শিক্ষার্থীরা যোগ দিতে চান বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে। অনেক পরের ধাপে পছন্দ থাকে সরকারি স্কুল কিংবা নামকরা বেসরকারি স্কুল-কলেজ। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ভাবনা জানতে রাজধানীর একটি নামকরা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সম্প্রতি ব্যতিক্রমী এক আয়োজন করে কর্তৃপক্ষ। সেখানে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হয় শিক্ষাজীবন শেষে কে কোন পেশায় যোগ দিতে চায়। ওই স্কুলের নবম শ্রেণির প্রায় ২০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দুজন শিক্ষকতা পেশায় আসতে চায় বলে জানায়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, যাঁরা একাল্টই অন্য কোথাও চাকরি না পান তাঁরা চিন্তা করেন এমপিওভুক্ত কলেজ এবং সবশেষে স্কুলের শিক্ষক হওয়ার কথা। শেষ সময়ে এসে যখন প্রার্থীর একটি চাকরি দরকার হয় আর প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটিরও দরকার হয় টাকার, তখন পাঁচ-সাত লাখ টাকা দিয়েই একজন প্রার্থী এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হয়ে যান। তাই দিন দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক বাড়লেও মান বাড়ছে না।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে। ফলে দক্ষ ও মেধাবীরা আসেন না। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকদের মানের অবনতি থেকেই যাচ্ছে। প্রাথমিকের পুরোটাই সরকার জাতীয়করণ করেছে। এবার মাধ্যমিকের মূল ধারাটাও নিয়মের মধ্যে আনতে হবে।'

জানা যায়, এমপিও চালু হওয়ার আগে যেসব শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই দক্ষ। কারণ তখন পরিচালনা কমিটিই টাকা সংগ্রহ করে শিক্ষকদের বেতন দিত। তাই কমিটি শিক্ষক নিয়োগের সময়ও বেশি গুরুত্ব দিত দক্ষতার দিকে। কিন্তু আগের সেই শিক্ষকদের বেশির ভাগই অবসরে চলে যাচ্ছেন। এখন যাঁরা আছেন তাঁদের বেশির ভাগই টাকা দিয়ে নিয়োগ পাওয়া। তাই মানের দিক দিয়েও তাঁরা সবচেয়ে বেশি দুর্বল ও অদক্ষ।

শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ড. মো. শরিফ উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কমিটমেন্টের জায়গা ২০ শতাংশের নিচে। কারণ তাঁদের বেশির ভাগই কোনো চাকরি না পেয়ে টাকার বিনিময়ে শিক্ষক হয়েছেন। এই পেশাও প্রধান হিসেবে নিচ্ছেন না তাঁরা। তাই দিনে দিনে এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মান নিম্নমুখী হচ্ছে। এখন যাঁরা এই পেশায় রয়েছেন তাঁদের যথাযথ ট্রেনিং দিতে হবে এবং মনিটরিং বাড়াতে হবে। আর শিক্ষকদের জীবনমানের উন্নয়ন করতে হবে। এতে মেধাবীরাও শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার স্বপ্ন দেখবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ হয়। কারণ সেটিও সেমি-গভার্নমেন্ট চাকরি। দক্ষ একজন শিক্ষক তো টাকা দিয়ে চাকরি নেবেন না। মূলত যাঁরা সব জায়গায় ঘুরেও চাকরি পান না তাঁরাই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষক হন। এর ফলে আমরা মোটেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় যেতে পারছি না। শিক্ষকদের মানও উন্নত হচ্ছে না। এখন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত আলাদা একটি মন্ত্রণালয় থাকা উচিত। আমরা প্রতিষ্ঠান সরকারি করি, কিন্তু আমাদের উচিত শিক্ষাকে সরকারি করা।'

বিশ্বের প্রায় সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থাই হয় সরকারি, নয়তো বেসরকারি। বাংলাদেশেই শুধু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন দেয় সরকার, আর প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে ম্যানেজিং কমিটি। বেসরকারি শিক্ষকদের ৫০ টাকা করে অনুদান দেওয়া শুরু হয় ১৯৮১ সালে। ১৯৮৪ সালে টাকার অঙ্ক ও পরিসর বাড়ানো হয়। ২০০৬ সাল থেকে শতভাগ মূল বেতনই দিচ্ছে সরকার। সেই প্রক্রিয়ার নামই এমপিও। এতে টাকা দিলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের কোনো নজরদারিই নেই। ইচ্ছামতো টাকার বিনিময়ে অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দেয় ম্যানেজিং কমিটি। যদিও চলতি বছর থেকে সরকার এই নিয়োগে লাগাম টানতে যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষাবিদরা বলছেন, এত দিন নিম্নমানের শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ায় তার খেসারত জাতিকে দিতে হবে আরো কয়েক যুগ। জানা যায়, মাউশির পক্ষ থেকে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সব প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এ বিষয়ে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক মো. এলিয়াছ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এখন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে শতভাগ বেতনই সরকার দেয়। এ ছাড়া আরো কিছু ভাতা দেওয়া হয়। যদি সব সরকারীকরণ করা হয় তাহলে অতিরিক্ত দিতে হবে বাড়ি ভাড়া। তবে এখন সরকারি করে নিলে এই বাড়ি ভাড়া পর্যায়ক্রমে দেওয়া যেতে পারে। পেনশনসহ সব সুবিধাও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে। অর্থাৎ এ পর্যন্ত নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা বর্তমান নিয়ম অনুযায়ীই অবসর সুবিধা পাবেন। এতে সরকারের ওপর চাপ পড়বে না। আর স্কুলের আয়ও তখন সরকারের খাতায় যোগ হবে। সব স্কুল সরকারীকরণের আওতায় এলে আমরা কঠোর মনিটরিং করতে পারব। নিয়োগ দেওয়া হবে দক্ষ শিক্ষক। অন্তত ২০-২৫ বছর পরে মানের ব্যাপারে কথা শুনতে হবে না।'

সবচেয়ে পিছিয়ে সিলেট অঞ্চল : মাউশির সর্বশেষ একাডেমিক সুপারভিশন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ঢাকা অঞ্চলে শতকরা প্রায় ৫৭ ভাগ প্রতিষ্ঠান সৃজনশীলে সম্পূর্ণ প্রশ্ন করতে পারে। ৩৭ শতাংশের বেশি প্রতিষ্ঠান বাইরে থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করে। রংপুর অঞ্চলেও প্রায় এই একই ধরনের ফল পাওয়া গেছে। তবে সবচেয়ে পিছিয়ে সিলেট। ওই অঞ্চলের শতকরা ৩৮ ভাগ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ প্রশ্ন নিজেরা করতে পারে। শতকরা ৪৭ ভাগের বেশি প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন আংশিক নিজেরা করে আর শতকরা ১৪ ভাগের বেশি প্রতিষ্ঠান বাইরে থেকে প্রশ্ন কিনে নেয়। এভাবে সব অঞ্চল মিলিয়ে শতকরা ৫৫ ভাগ বিদ্যালয় নিজেরা পরীক্ষার সব বিষয়ের প্রশ্ন তৈরি করতে পারে। যদিও মাঠপর্যায়ের চিত্র আরো করুণ।

দক্ষ শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীরাও দুর্বল হচ্ছে : গত বছর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের শিক্ষাবিষয়ক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অষ্টম শ্রেণির ৫৬ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলায়, ৫৬ শতাংশ ইংরেজিতে ও ৬৫ শতাংশ গণিতে নির্ধারিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। বিশ্বব্যাংক তাদের সুপারিশে বলছে, স্কুলের যেসব উপকরণ ভালো শিখনে অবদান রাখতে পারে, এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক উপকরণ হচ্ছে দক্ষ শিক্ষক। শিক্ষার্থীরা কী শিখছে, কী করে শিখছে এবং সামগ্রিকভাবে কতটুকু বুঝতে পারছে তা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন শিক্ষকরা। তবে এই শিক্ষকদেরই পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। পড়ানোর বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা শিক্ষার্থীদের শিখনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

২০১৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তির জন্য উত্তীর্ণ হয়েছিল মাত্র দুজন। অথচ ওই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ৭০ শতাংশই ছিল এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পাওয়া। তখন শিক্ষাবিদরা বলেছিলেন, শিক্ষার তিন স্তরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। কারণ এই স্তরেই শিক্ষার্থীদের গড়ে ওঠার সময়। অথচ সেখানকার শিক্ষকরাই সবচেয়ে বেশি অদক্ষ। এমপিওভুক্ত শিক্ষক হতে লাগে টাকা, দক্ষতা নয়। তাঁদের কাছ থেকে মানসম্মত শিক্ষা আশা করা যায় না।

মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পাঁচ-দশ বছরের তুলনায় বর্তমানে শিক্ষকের মান বেড়েছে। আমরা শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াতে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছি। তবে নিয়োগপ্রক্রিয়া সঠিক না হওয়ায় দক্ষ শিক্ষক পাচ্ছি না। এরই মধ্যে নিয়োগেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। তবে শিক্ষকদের আরো বেশি নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। সেই অভাবটা রয়েছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন ৫০ থেকে ৬০ হাজার শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষকরা বলছেন, এমপিওভুক্ত শিক্ষকের সংখ্যাই প্রায় তিন লাখ ৬০ হাজার। সরকারি স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে আট হাজার। আর এমপিও-বহির্ভূত মাধ্যমিকে শিক্ষকের সংখ্যাও লক্ষাধিক। সৃজনশীল বিষয়ে পৌনে পাঁচ লাখ শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেলেও অনেক শিক্ষক এখনো প্রশিক্ষণের আওতায় আসেননি। কারণ অনেকে একাধিকবার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এ ছাড়া তিন বা সাত দিনের প্রশিক্ষণে একজন শিক্ষকের পক্ষে সৃজনশীল আয়ত্ত করা কতটা সম্ভব, সেই প্রশ্নও রয়েছে।

জানা যায়, এমপিওভুক্ত স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের সংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার। এর বাইরে আরো ১০ হাজার বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অথচ সরকারি স্কুল-কলেজের সংখ্যা মাত্র সাড়ে ছয় শ। বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ে এক কোটি ৩৫ লাখ শিক্ষার্থী।